আলিম্পন

কৃষ্ণনগর উইমেন্স কলেজ পত্রিকা

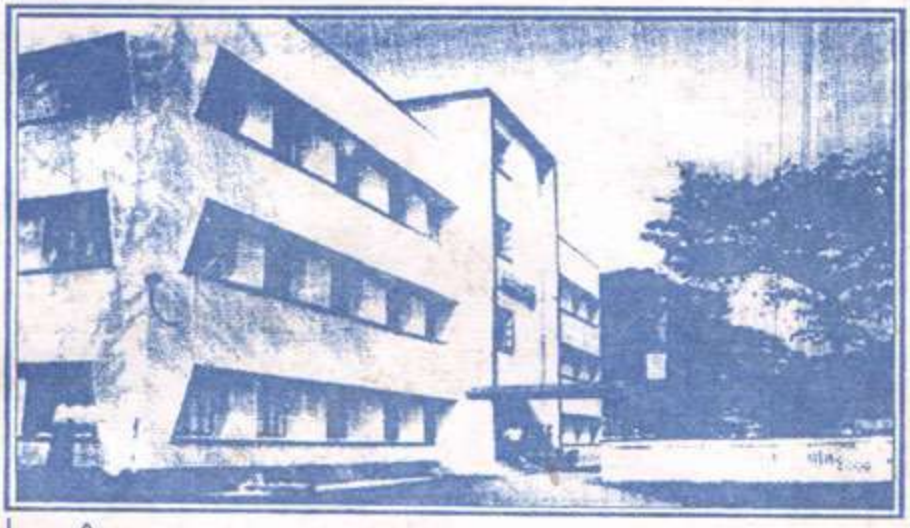

২০১২- ২০১৩

আলোক

কৃষ্ণনগর উইমেন্স কলেজ পত্রিকা

২০১২- ২০১৩

বার্ষিক সংকলন

৪১ তম সংখ্যা

সম্পাদনা ঃ ঋতুপর্ণা পাল

অধ্যক্ষারপ্রতিবেদন

কৃষ্ণনগর উইমেন্স কলেজের ছাত্রী সংসদের সৌজন্যে কলেজ পত্রিকা প্রতিবছরের মত এবছরও প্রকাশিত হল। চারিদিকের অশান্ত সামাজিক পরিবেশের মধ্যে আমাদের ছাত্রীরা যে সুস্থ, সুশৃঙ্খল সাহিত্যকর্মে নিজেদের মগ্ন রেখেছে, প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসাবে আমি সত্যিই গর্বিত। "ছাত্রানাং অধ্যায়নং তপঃ"-এই আপ্তবাক্যে বিশ্বাস রেখেই বলতে হয় নিত্য দিনের পঠন পাঠনের মধ্যে ও সুপ্ত প্রতিভা আত্মবিকাশের পথ খোঁজে। সেই প্রকাশোন্মুখ মনের পাণীরূপ পাঠকের দরবারে পৌছে দেবার মাধ্যম হল পত্রিকা। ভবিষ্যতের সাহিত্যিক শিল্পীর কাছে বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ের পত্রিকা উদ্বোধন মঞ্চের মত। ছাত্রী সংসদের এই পত্রিকা গল্পে, কবিতায় ও প্রবন্ধে-বর্তমান ছাত্রী, অধ্যাপক, অধ্যাপিকা, শিক্ষাকর্মী বৃন্দের অনুপ্রেরণায় সমৃদ্ধ। কলেজের ঐতিহ্য বজায় রেখে এই পত্রিকা চলমান থাকুক- এই আমার আশীব্বর্শদ।

ড. প্রণতি মিনহা মল্লিক

কৃষ্ণনগর উইমেন্স কলেজ

পত্রিকা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপিকা

দুটি কথা-শীত মানেই কনকনে হাওয়া, কুয়াশার চাদর, মেঘ-রৌদ্রের খেলা, শীত মানেই পিঠে পুলি, নলেন গুড়, বনভোজনের পালা। শীত মানেই রোদে পিঠ দিয়ে গোল হয়ে বসে নানাতর আলাপ সালাপ। কথার পিঠে কথা বসিয়ে আলাপের আলপনা। তাকেই খানিকটা সাজিয়ে তোলার বাৎসরিক প্রচেষ্টা। কালো হরফের সুতোয় গেঁথে, উষ্ণতার পরশে মেখে এ আলাপের ভান্ডারে কাঁচা কথার ভিড়ই হয়তো বেশী। হোকনা বয়স এবং মন- দুইই তো কাঁচাই। নিজের নামকে ছাপার অক্ষরে দেখার আনন্দই বা কম কিসে ? এরই মধ্যে কারো মধ্যে ভবিষ্যতের সম্ভাবনার বীজ যদি থাকে, সেতো বাড়তি পাওনা। ততদিন 'আলাপ' চলুক-চলতে থাকুক। 'আলাপ' জমুক, জমে উঠুক।

সাধারণ সম্পাদিকা

সততা আমার ধর্ম-নিষ্ঠা আমার কর্ম, আর এই কলেজ আমার প্রাণ, কলেজের অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের আশীর্ব্বাদ আমার পথ চলার পাথেয়, বন্ধুদের সহযোগীতা আমার শক্তি, বোনেদের শ্রদ্ধা আমার অনুপ্রেরণা, আর সকলের সুখ আমার স্বপ্ন।

পত্রিকা বিভাগ

নতুন বছরের শুভেচ্ছা সহ তোমাদেরই সহযোগীতায় আমরা তোমাদের ইচ্ছাপূরণ করলাম। আমরা তোমাদের কথা দিচ্ছি এবারের মত আগামী বছরগুলিতেও আরো সুন্দরভাবে পত্রিকা প্রকাশের কাজ করব।

College

প্রথম দিনের College
দারুন এক Knowledge
নতুন নতুন Friend
পুরানো সব The end
শুধু একটাই Problem
দিদিদের আছে G.S. এর Claim
ভিন্ন রকম Style
সুন্দরীদের Pile
গল্প চলে Non stop
পড়াশুনা Full stop
সুযোগ পেলেই Canteen
মেতে ওঠে Age of eighteen
মন বলে Let's go in the rain
Because we are women.

- ছন্দা ঘোষ
প্রথম বর্ষ

নারী

আমি এক নারী
শিক্ষায়-চেতনায়-মূল্যবোধে,
এগিয়ে চলা সমাজের বুকে-
আমিও একজন।
মেরুদণ্ডহীন এই সমাজে-
সত্যিই কি আজ আমার কোন স্বীকৃতি আছে ?
হায়! প্রতিনিয়ত এই সুন্দর মূল্যবোধের পৃথিবীতে
কোথাও না কোথাও ধর্ষিত হচ্ছি আমি,
আর কি নৃশংস ভাবেই না,
মরতে হচ্ছে পার্থিব বস্তুর মত আমায়।
কিছু ফুল আর মোমবাতির আলোয়
আমি বারবার সমাজকে সচেতন হবার বার্তা দিচ্ছি,
কিন্তু কেউ কি শুনছে আমার কথা ?
মনে রাখছে আমার কথা ?
এই পোড়া পৃথিবীতে আমার মূল্যবোধ,
এই সমাজের কাছে এক ধর্ষিতা নারী,
নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ ছাড়া আর কিছুই নয়।

- দূর্বা মন্ডল
তৃতীয় বর্ষ

আকাশ কুসুম

নীল আকাশের নীলিমাতে
চাই যেতে আজ হারিয়ে,
চাইনা থাকতে পৃথিবীতে আর
মাটির উপর দাঁড়িয়ে।
গগন মাঝে ভাসতে চাই
পাখির মত উড়তে চাই,
নীল পরীদের দেশে গিয়ে
ফুলের মত ফুটতে চাই।
ফুলের রেণু মাখব গায়ে
বন্ধু হবে নীল পরী,
খুশির সুবাস ছড়িয়ে দেব
বাইব সাদা মেঘ তরী।

- সুপ্তি লোধ
প্রথম বর্ষ

স্বপ্ন

স্বপ্ন যখন সত্যি হয়ে তোমার কাছে আসে।
স্বপ্ন যখন নীল বেদনায় তোমার চোখে ভাসে।
স্বপ্ন-ই তো সত্যিটাকে নাওনা জীবন হেসে।
স্বপ্ন দেখার হাতছানিটা নেবেই যেথা ক্লেশে।
তবুও তুমি থাকবে জানি সত্যি রাজার দেশে।
দেখবে যখন.....
আকাশ পানে রামধনুরই মেলা
তারই আলোয় আমায় দেখে কাটবে সারা বেলা।
জীবন নদী চলতে গিয়ে হঠাৎ যদি থামে ।
দেখবে তখন জীবনটা এক কালো হীরের দামে।

- ঋতুপর্ণা ভট্টাচার্য
প্রথম বর্ষ

দামিনী

করতে গিয়ে দুষ্টের দমন
জীবন দিলে তুমি,
আর কেউ নও, তুমি
তুমিই দামিনী।
নিজের জীবন বিপন্ন করে
রেখে গেলে অনেক প্রশ্ন।
পিশাচ ওরা ধিক্কার ওদের -
নেইকো মানুষের কোন চিহ্ন।
তুমি সাহসিনী, তুমি নির্ভয়া, তুমিই
মোদের প্রেরণা।
তামাম ভারতবাসী আমরা চাই-
ওদের চরম শাস্তির কামনা।

- মিঠু সিকদার
প্রথম বর্ষ

কেউ

ডাকছে আকাশ ডাকছে বাতাস
ডাকছে মাঠের ঘাস
ডাকছে মাটি ডাকছে পাহাড়
ডাকছে রাজহাঁস।
ডাকছে তোমায় ডাকছে আমায়
নীল সাগরের ঢেউ,
ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে আমায়
ডাকছে মনে কেউ
ডাকছে তোমায় ধ্রুবতারা
সাঁঝ আকাশের সন্ধ্যাতারা,
সাঁঝের সন্ধ্যা প্রদীপ হয়ে
ডাকছে যেন সেও।
ডাকছে তোমায় ডাকছে আমায়
ডাকছে যেন কেউ।

- দেবারতি সামন্ত
প্রথম বর্ষ

স্বপ্ন

স্বপ্ন আকাশ জুড়ে
স্বপ্ন জাগে মনে,
স্বপ্ন আসে সজীব প্রাণে
দুটি চোখের কোণে।
স্বপ্ন আসে ঝর্ণার মত
উদ্দাম গতিতে,
স্বপ্ন আসে দোয়েল, ফিঙ্গে
পাখির বুলিতে।
স্বপ্ন আসে সহজপাঠের
কবিতা আর ছড়ায়,
স্বপ্ন এসে মনের কোণে
গোপন জ্বালা ঝরায়।
স্বপ্নের আমি
স্বপ্নের তুমি
স্বপ্ন দুঃখের সুখ,
স্বপ্ন আসে সজীবতায়
ভরিয়ে দিতে বুক

- পায়েল পাল
প্রথম বর্ষ

আশার কথা

ফুলের কোমল পরশ দিলাম
তোমার দুচোখ ছুঁয়ে,
মনের শত দুঃখ যাবে
চোখের জলে ধুয়ে।
পুরোনো সেই বন্ধুত্ব
আবার পাবে ফিরে,
যাকে হারিয়েছিলাম এই পৃথিবীর
হাজার লোকের ভিড়ে।
শুধু মনটাকে আজ শক্ত করো
মনে আনো জোর,
দেখো কাটবে ঠিকই অমানিশা
আসবে আবার ভোর।
হারিয়ে যাওয়া বন্ধুরা সব
বাড়িয়ে দেবে হাত,
ভোরের আলো মিষ্টি হেসে
জানাবে সুপ্রভাত।

- দেবারতি সামন্ত
প্রথম বর্ষ

বন্দী

মিষ্টি রোদের দুষ্টু হাসি
সৃষ্টিছাড়া টান,
সকাল বেলা উদাস করে
আমার মন ও প্রাণ।
পড়তে বসলে বসেনা মন
পড়ার বইয়ের মাঝে,
নীল আকাশের আহ্বান ধ্বনি
কানে আমার বাজে।
একাকী চাঁদ হাতছানি দেয়
মনটা ওঠে কেঁদে,
তবু মাটির পৃথিবী প্রতিমুহূর্তে
রাখে আমায় বেঁধে।
খাঁচায় বন্দী পাখি আমি
উড়তে পারিনা,
উড়তে গেলেই নিষেধ এসে
জড়িয়ে ধরে পা।

-লাবণী বিশ্বাস
প্রথম বর্ষ

দিনের আলো

রাতের শেষে হল দিন, ঘুচলো রাতের চাঁদর ঋণ,
উঠল ফুটে সূর্য কিরণ নাচল সুখে বনের হিরণ।
সারা রাতের স্বপ্নগুলি হাসছে মিঠি মিঠি,
পাখির আওয়াজ খামে ভরে বাতাস পাঠায় চিঠি।
কুঞ্জবনে ভোমরাগুলি মধুর খোঁজে দিল পাড়ি,
অন্যদেশে অন্যবেশে গড়বে তারা নতুন বাড়ি।
মাটির মেঠো গন্ধ নিয়ে আকাশ বাতাস ভরপুর,
সবার মনে আনন্দও সবার মনে খুশির সুখ

পারভিন খাতুন
প্রথম বর্ষ

স্বপ্ন

মনে মনে ভাবি বসে কত কিছু সারাদিন
যা কিছু স্বপ্ন দেখি, সত্যি কি তা হবে কোনদিন ?
আমার মনে যা স্বপ্ন এনেছ প্রভু,
সত্যি করো তুমি ভেঙো না তা কভু।
যদি এসব কিছু হয় স্বপ্ন, তবে স্বপ্নই থাক,
ঘুম থেকে তুমি তুলোনা।
যদি এসব কিছু হয় স্বপ্ন, তবে স্বপ্নই থাক,
অবুঝ মনকে তুমি ভাবতে বাধা দিওনা।
স্বপ্ন কভু হয়নি পূরণ হয়ত হবে না,
তবু যেন স্বপ্নকে হারাতে পারবনা।
স্বপ্ন ভোরের আবছা আলো তবু যেন সত্য
তাই প্রতিমুহূর্তে মন স্বপ্ন দেখতে মত্ত।

- পারভিন খাতুন
প্রথম বর্ষ

পূজনীয়

জীবন আকাশে সূর্য্য তুমি যে
ত্যাগের দৃপ্ত বাণী,
অন্যায় দেখে কঠোর হয়েছে
তোমার কোমল পাণি।
দ্বন্দ্ব হিংসা হানাহানি যত
ধ্বংস করেছ তুমি,
মৃতপ্রায় শেষে প্রাণ ফিরে পায়
তোমার চরণ চুমি।
বহু বিবাহ কে নিন্দা করেছ
দূর করে সতীদাহ,
দীন হীন মুখে ফুটিয়েছ হাসি
এনেছ সুখ প্রবাহ।
মুঝিয়ে দিয়েছ সকল কালিমা
এনেছ জ্ঞানের আলো,
শিখিয়েছ তুমি হিংসা ভুলে
সবারে বাসিতে ভালো।
প্রাণবা তুমি মানব কৃতির
সকলের তুমি প্রিয়,
লহ আজ মোর শ্রদ্ধা, প্রণাম
ওগো মোর পূজনীয়।

- সুপ্তি লোধ
প্রথম বর্ষ

বাঁচতে যদি চাও

নির্বিচারে কাটে গাছ
উষ্ণ হচ্ছে বিশ্ব,
নির্বোধ তোমরা বুঝবে না যে
পৃথিবী হচ্ছে নিঃস্ব।
মৃত্তিকা যে হচ্ছে ক্ষয়,
তাতেও তোমাদের নেইকো ভয়।
গলছে বরফ দুই মেরুতে,
জল বাড়ছে সমুদ্রেতে।
ধ্বংসের রাস্তা পরিষ্কার,
নেইতো দেরি বেশি আর।
পৃথিবী ডুববে জলের তোড়ে,
তোমরা যাবে পরপারে।
থাকতে যদি চাও ভবে,
অরণ্যকে বাঁচাতে হবে।
লুপ্তপ্রায় প্রাণী রক্ষা করো,
সুজলা সুফলা পৃথিবী গড়ো।

- রিয়া দত্ত
প্রথম বর্ষ

বসন্ত জাগ্রত দ্বারে

হে বসন্ত লহ প্রণাম
চুমি তব পদরেণু।
তুমি করছো আমারে পূর্ণ।
শোভিত করেছ ফুলে ফলে এই ভুবন।
সাজিয়ে দিয়েছ তব রঙে।
কি অপরূপ রূপ হেরি তব।
ধন্য আমি, ধন্য আজি তোমার স্পর্শে,
তোমার রঙে রাঙিয়ে দিয়েছো মোরে।
ঝরিয়ে দিয়েছ রঙ পাতায় পাতায়,
ফুলে ফুলে আম্র মুকুলে।
ভরিয়ে দিয়েছ খেয়া মৃদুমন্দ বাতাসে
কুঞ্জে কুঞ্জে ছড়িয়ে পড়েছে কোকিলের কলতান।
গুঞ্জে গুঞ্জে অলি আজ করে পুষ্প সুধা পান।
রুক্ষতার বক্ষ মাঝে এনেছ তুমি প্রাণ।
তাইতো তুমি বসন্ত, চির নতুনের আহ্বান।

- যশোদা ঘোষ
তৃতীয় বর্ষ

অরিত্রর শপথ

ভুলের তরী ফুলে ভরে,
হাজার না- এর বাঁধন ছিঁড়ে,
নদী ছেড়ে সাগর বুকে,
ভাসিয়েছে তরী কপাল ঠুকে।
ভয় তবুও বয়সের সাহসখানা,
সমুদ্রের ঢেউকে ভেবে মুক্তদানা!
চলছে ছুটে দিশেহারা হয়ে!
ভয় অজানা এক ভবিতব্য নিয়ে।
জানেনা সে কোথা যাবে?
আসছে প্রভাতে কী হবে ?
না কি থেমে যাবে !
মাঝ সাগরে !
না কি ডুবে যাবে
সমুদ্রের গভীরে !
পাবে কোন ঠিকানা?
সবই তার অজানা।
তবু সে ছুটবে, পাড়ি দেবে।
দূর থেকে দূর সমুদ্রে।
সকল বাধা বিঘ্ন ঠেলে-
হাসবে জয়ের প্রদীপ জ্বেলে।
হয়ত চলার পথে হবে ভুল,
তবুও ফোটাবে বুকে আশার ফুল।
সত্যকে সে করবে মশাল।
অন্ধকারকে করে আড়াল।
আশঙ্কা তার আবেগের কুয়াশা।
দেখায় যদি, ভুল পথের দিশা,
অনেক ভয়, বাধার শঙ্কা,
তবুও বাজাবে জয়ের ডঙ্কা।
সপথ নিয়েছে এক বস্তির ছেলে,
জয়ী হবে জীবনের তুফান ঠেলে।
ছাড়াবে মায়ের দুঃখের বেশ,
আনবে মায়ের জীবনে খুশির রেশ।
এই তার জীবনের লক্ষ্য,
তা পূরণের শপথ নিয়েছে অরিত্র।
হে ঈশ্বর একে দাও আশীর্বাদ,
এ ছেলে পাক জয়ের আস্বাদ।

- সুরমিতা সাহা
তৃতীয় বর্ষ

সুখের কথা

সুখ হল এক সোনালি কল্পনা,
দুঃখ মাঝে রঙীন কিছু আল্পনা।
অসময়ে ভাঙা ঘুমের রেশ,
আঁধার রূপী দুঃখের অবশেষ।
সুখ হল এক ছোট্ট রঙিন পাখি,
মন কেড়ে নেওয়া কাজল কালো আঁখি।
সুখ মানে হল বন্ধুর প্রতি বন্ধুর অভিযোগ,
মনের জোড়ে কাটিয়ে ওঠা সব মানসিক রোগ।
সুখ মানে পূর্ণিমাতে চন্দ্রালোকিত রাত,
সুখ হল এক কোমল পরশ, বন্ধুর হাতে হাত।
সুখ মানে হল গাছের ডালে ছোট্ট পাখির বাসা,
শিশুর প্রতি পিতা মাতার মনে সুপ্ত আশা।
সুখ মানে হল তোমার দুঃখে আমার চোখে জল,
দুঃসময়ে পাশে থাকা দুঃসাহসী দল।
সুখ মানে হল কথার খেলাপে বন্ধুর প্রতি রাগ,
সুখ মানে হল সকল কিছুর সমান সমান ভাগ।

- অঙ্কিতা বিশ্বাস
প্রথম বর্ষ

আশার ছলনা

মরুভূমির জীবনেতে শুধুই খুজে গেছি মরুদ্যান
খোঁজার নেশায় ভুলেই গেছি সবার ভাগ্য নয় সমান।।
বালিয়াড়ির জীবনেতে সাজানো কত শত মরিচিকা
ধূলি ধূসর মরুর ঝড়ে হারিয়ে গেছে আমার দিশা।।
ফুল ভেবে কাঁটাটাকে ধরেছিলাম বুকে
জানি সেও গেলে
ক্ষণিকের হাসিতে বেদনাকে ঢাকা যায়
চিরতরে মুছে দিতে জানেনা কেউ সে উপায়।।
রঙিন তুলিতে যায় স্বপ্নকে সাজানো
কখনো যায়না এই বাস্তবটাকে এড়ানো।।
বহুবার আসে আর, বহু যায় চলে
সাজানো বাগান হতে ফুল যায় পরে।।
হয়ত বুঝবেনা আজ এ নারীর বেদনা
কেউ যেন না সহে এ আশার ছলনা।।

- যশোদা ঘোষ
তৃতীয় বর্ষ

গদ্য রচনা

আমার ডেরা পাহাড় ঘেরা চা বাগীচার মাঝে,
স্মৃতির গুঁতোয় যখন তখন মন লাগে না কাজে।
কু ঝিক ঝিক রেলগাড়িতে সটান শিলিগুড়ি
শিলাগড়ের পাহার ঢেকে প্রসাদ ঝুরি ঝুরি
সেখান থেকে ডাক পাঠাল সবুজ ঘন ফরেস্ট-
শ্যামলীমায় চোখ মেখে নাও, সেটাই হবে বেস্ট।
রাস্তাখানি গেছে চলে সবুজ বনের ফাঁকে -
'হেই সামালো' - নীল পাহাড়ের চুলের কাঁটার বাঁকে।
এপার ওপার পাহাড়, মাঝে করোনেশন সেতু,
ইচ্ছা হল একটু থামা দেবী দর্শন হেতু।
গহন খাদে খরস্রোতা নীলচে সবুজ জলে-
সমস্ত পথ তিস্তা আমার সঙ্গে সঙ্গে চলে।
কালি ঝোরা পাশ কাটিয়ে ব্রিজ পেড়লে মংপং
আলোয় মাখা ঝর্ণাগুলোয় খেলছে কেমন সাত রং।
পাহাড় পথের শেষ বাঁকটি যেই না গেল মিলিয়ে -
তরাই ডুয়ার্স হাতছানি দেয় হাসিতে ঝিকমিকিয়ে।
শিরশিরিয়ে কাঁপন জাগে উত্তরে সেই বাতাসে,
মনের কাঁপন তারই সাথে আনন্দেতে মাখা সে।
লিস পেরোবে ঘিস পেরোবে সামনে দেখ মেচি।
একটুখানি সবুর করো--এবার পৌঁছে গেছি।
চা বাগিচার কোনায় কোনায় চোখ রেখেছি যখনই-
পাতা তোলায় ব্যস্ত দেখি মদেশীয় রমণী।
এলাম তবে, এসেই গেলাম, ওই তো আমার বাসা।
ভালোবাসায় মন ভেজানো আমার ভালোবাসা।

- মালা ঘোষ

(বাংলা বিভাগ)

অনিশ্চিতের সনেট

অন্য রাতের ভুল ঠেলে ওঠা হিপপকেট
ফেলে যায়, তার পুরানো পালক ওভারস্মার্ট,
কোনদিন তার রাত্রি-ছোঁয়ানো আমার স্কুল
শানিয়ে গিয়েছে পৌষ মাসের রকিং ফ্লাট।
ফুরফুরে হাওয়া হট্ জিন্‌ষের উল্টো ডাক
প্র্যাকটিকালের ক্লাস ভেঙ্গে গেলে যে রিং টোন
হঠাৎ বেজেছে, মিয়োনো ফুলের কর্মযোগ
এইখানে তার অন্ধরাতের পর্যটন-
যেখানে যখন চেনা পথ, তার ডাকের ভার
কে কাকে চেনায়, কোথায় নামায় অন্ধপট
ফোনের টাওয়ারে পাখির আকাশ পণ্যমন,
চোখের আকাশে মন খোঁজে তার রিভার-ডট।
তাহলে তোমাকে ভোলানোর গানে সে ফ্লুরোসেন্ট
অন্যদিনের পার্কিং কোনে অ্যালোটমেন্ট।

-সুমন ভট্টাচার্য

(বাংলা বিভাগ)

জয় মা দুর্গা

আশ্বিন মাসের শুক্রপক্ষের ষষ্ঠী তিথিতে,
উলুধ্বনি শঙ্খধ্বনি মা বসলেন পাটে
লক্ষ্মী আর সরস্বতী, কার্ত্তিক আর গণেশ
মায়ের সাথে আসেন সবাই পরে নতুন বেশ
ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী আর নবমী
এর পরেতো মায়ের যাওয়া বিজয়া দশমী।
চারদিনের এই আসা যাওয়া প্রতি বছরে।
চারদিন তাই জমজমাট পূজার আসরে।
খুশি মনে সবাই তাই মায়ের অপেক্ষায়,
মায়ের সাথে চারদিন আনন্দেতে কাটাই।
সন্তানের মুখ চেয়ে মা থাকেন না তো বেশি।
দশমীতে সবার তাই দুঃখ রাশি রাশি।
চোখের জলে তাইতো, মাকে বিদায় দিতে হয়
আসছে বছর এসো আবার থাকি প্রত্যাশায়।

- সুরমিতা সাহা
তৃতীয় বর্ষ

অব্যক্ত কথা

আজ মনে পড়ে গেল বৃষ্টি-ভেজা সেই মূহর্তটার কথা।
পার্কের এককোনে কৃষ্ণচূড়া গাছের নীচে দাঁড়িয়ে ছিলিস তুই।
এলোমেলো হাওয়া কোমল পরশে মুছিয়ে দিচ্ছিল তোর কলেজ ফেরৎ শরীরের ক্লান্তি ।
কি মায়াবী দেখতে লাগছিল তোকে !
টুপ টাপ ঝরে পড়ছিল কৃষ্ণচূড়া ফুল তোকে স্পর্শ করার আশায়।
খুব ইচ্ছা করছিল এক দৌড়ে ছুটে গিয়ে তোকে বলি -
'আমি চিনি গো চিনি তোমারে ওগো বিদেশিনী'
হঠাৎ আকাশের সীমাহীন নীলীমা ঢাকা পরে গেল কালো মেঘের ওড়নায়। ঝড়ো হাওয়া ও বিদ্যুৎ চমকানোর একটু পড়েই শ্রাবণের বারিধারা স্পর্শ করল ধরণীর বক্ষ স্থল। বৃষ্টির রূপোলি ধারায় নিজেকে উজার করে দিয়ে একসময় তুই চলে গেলি। তুই-হীন পার্কে একটা বেঞ্চে বসে রইলাম বর্ষণসিক্ত একাকী আমি। তোর কাছে না বলা থেকে গেল তোকে ভালোলাগার কথা, অব্যক্ত থেকে গেল তোর কাছে আমার বন্ধুত্ব নিবেদনের আকুতি। তাই মনে মনে বললাম-

'তোমার কাছে চাইনি কিছুই
জানাইনি মোর নাম
তুমি যখন চলে গেলে
নীরব রহিলাম।'

- সুপ্তি লোধ
প্রথম বর্ষ

ক্ষনিকের দেখা

আজকেই শেষ দিন সুমী র দার্জিলিং এ। এবার তাদের ফিরে যাবার পালা। বাবার স্কুলের পূজার ছুটিতে তারা বেড়াতে গেছিল দার্জিলিং- এ। দার্জিলিং-এর বর্নাতীত প্রাকৃতিক দৃশ্যের মায়াজালে সে যেন ছিল এক স্বপ্নাতীত স্বর্গদ্যানে। মনের মধ্যে একগুচ্ছ স্বপ্নিল রঙে অঙ্কিত বর্ণনার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে এবার সুমীকে ফিরে যেতে হবে।

সকাল সাড়ে - আটটায় তারা রওনা দিল হোটেল থেকে বাসস্ট্যান্ড এর উদ্দেশ্যে। সেখান থেকে ছোট গাড়ি ধরে শিলিগুড়ি স্টেশনে পৌছে তারপর তারা সেখান থেকে রওনা হবে 'কোলকাতা এক্সপ্রেসে' কোলকাতার উদ্দেশ্যে। তাদের ছোট গাড়ি প্রায় ছেড়েই দিয়েছিল রওনার উদ্দেশ্যে, ঠিক সেই মুহূর্তে একজন পুরুষ যাত্রী এসে বসল তার পাশের সীটে। লম্বা, সুদর্শন, স্মার্ট ছেলেটি এক মুহূর্তের জন্য তাকালো সুমীর দিকে। দুজনেই দৃষ্টিবদ্ধ হল পরস্পরের প্রতি। এরপর দার্জিলিং এর চারপাশে ছড়িয়ে থাকা অফুরন্ত প্রাকৃতিক শোভা সাদা মেঘের মধ্যে উচু পাহাড় শৃঙ্গের মধ্যে মিশে যাওয়া প্রভৃতি দৃশ্য দেখতে দেখতে কেটে গেল সুমীর কিছুটা সময়।

তারপর হঠাৎ পাশে বসে থাকা ছেলেটি আলাপচারিতা শুরু করল। নানা লঘু প্রসঙ্গ দিয়ে তাদের কথা বার্তা শুরু হল। তাদের পরস্পর কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে সময় অতিবাহিত হতে লাগল। হঠাৎই সুমীর কালো চোখ দুটির দৃষ্টি রূদ্ধ হয়ে গেল পাশে বসে থাকা ছেলেটির চোখের চাহনিতে। সে সঙ্গে সঙ্গে সলজ্জভাবে তার দৃষ্টি অন্যদিকে নিক্ষেপ করল। কেন জানিনা, সুমীর কিছু একটা মনে হল। এরই মধ্যে শিলিগুড়ি স্টেশনে তাদের গাড়ি এসে পৌছালো। এবার তাদের চলে যাবার পালা, কিন্তু কিছুতেই তার মন যেতে চাইছে না, ছেলেটির সঙ্গে আলাপচারিতার ঐ অল্প সময়ের মধ্যেই সুমীর মনে হয়েছিল তারা যেন সত্যি পরস্পর পরস্পরের কত চেনা।

হয়ত জীবনে কিছু মানুষের আগমন হয়ই কিছু সময়ের জন্য। এখানে যেমন সে কিছুদিনের জন্যই বেড়াতে এসেছিল, ঠিক তেমনই ছেলেটির সঙ্গে তার পথে আলাপ ও ছিল হয়ত কিছুক্ষণেরই জন্য। যাওয়ার সময় সুমী অস্পষ্ট কুয়াশার মধ্যে দিয়ে দেখতে পেল সেই ছেলেটি গাড়ীর জানালার মধ্যে দিয়ে এক দৃষ্টে চেয়ে আছে তার দিকে।

- মৌসুমী দত্ত
দ্বিতীয় বর্ষ

মনের মণিকোঠায় ৯ই জানুয়ারি, ২০০৮

ছাত্র জীবন হ'ল সুখ দুঃখের সাজানো পসরা। এই সময়ের বহু ঘটনায় আমাদের মনে রেখাপাত করে যায়। আর ঐ সকল ঘটনাই হয়ে যায় স্মরণীয় ঘটনা। আজ ছাত্রজীবনের একটি স্মরণীয় ঘটনার কথা লিখতে গিয়ে বহু ঘটনায় মনরূপ টেলিভিশনের স্ক্রিনে ফুটে উঠছে কিন্তু তার মধ্যে যে ঘটনাটির কথা আজ লিখব তাহল - একটি পরিবেশ পর্যবেক্ষণ শিবিরের কথা।

সবুজ গাছ পালা ঘেরা অরণ্যের নিস্তব্ধতা ও শ্যামলিমার মাঝে বিভিন্ন প্রাণীর স্বতঃস্ফূর্ত বিচরণের প্রতি আমি ছোটবেলা থেকেই আকৃষ্ট। যারফলে সুযোগ পেলেই ছুটে যায় সবুজের সান্নিধ্যে। হঠাৎই পেয়ে গেলাম সবুজের মাঝে Study করার সোনালি সুযোগ। পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চ দ্বারা পরিচালিত কৃষ্ণনগর জোনাল কমিটির ঐ পর্যবেক্ষণ শিবিরের আয়োজন করেছিলেন। ৯ই জানুয়ারি, ২০০৮, সকাল ৮টার সময় কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরির মাঠ থেকে বাসে করে হাজরাপোতা গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলামা আমরা। শহরের পরিবেশের মধ্যে দিয়ে কিছুক্ষণ যাওয়ার পর যখন আমরা গ্রাম্য পরিবেশে প্রবেশ করেছিলাম তখন নিজেরই অজান্তে গিয়ে উঠেছিলাম-

"হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে, ময়ুরের মত নাচেরে"

সকাল ১০টার সময় আমরা গ্রাম্য সরু রাস্তা দিয়ে কিছুটা যাওয়ার পর হাজারাপোতা গ্রামে অবস্থিত পাঁচপোতা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে থেমেছিলাম। এরপর শুরু হয়েছিল সবুজ মনে শ্যামলিমার মাঝে সবুজকে ভালোবাসার সবুজ প্রয়াস। ধেনো জমির আল ধরে হাটতে হাটতে আমরা প্রায় পোঁছালাম ছাড়িগঙ্গা নামক বিলের সামনে। পূর্বে এটি গঙ্গার সাথে যুক্ত থাকলেও পরে তা পৃথক হয়ে যায়, তাই এরকম নাম বিলটির। স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছ থেকে জানা গিয়েছিল যে, বছরে এর থেকে প্রায় ১০০ টন মাছ উত্তেলিত হয়। ২৫ ফুট গভীর এই বিলটি প্রায় ১৫হাজার একর অঞ্চল নিয়ে অবস্থিত। শিক্ষক মহাশয় জানিয়েছিলেন এটি আসলে একটি মজা নদী যার চারপাশে ৪৮কিঃমিঃ বাঁধ দেওয়া হয়েছে বন্যা প্রতিরোধের জন্য। যদিও ভালোই বেলা হয়েছিল কিন্তু বিলটির উপর কুয়াশাচ্ছন্ন ভাব থাকায় চারপাশের সবকিছু দেখতে পাচ্ছিলাম না। চারপাশের জমি গুলিতে চাষিরা গভীর তৎপরতার সাথে

ধান, যব, ধনে পাতা চাষ করছিলেন। ছাড়ি গঙ্গার ওপারে সুদুর রাশিয়া, সাইবেরিয়া থেকে বহু পরিযায়ী পাখি আসে বলে শুনেছিলাম কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাদের দেখতে পাইনি। গ্রামটিতে ঘোরার সময় অসংখ্য তালগাছ, বাঁশঝাড়, বাবালা গাছ দেখতে পেয়েছিলাম। এরপর আমরা গিয়েছিলাম ছাড়িগঙ্গাতে সৃষ্ট দ্বীপটিতে। পলি গঠিত মাটি হওয়ার দ্বীপটিতে যব, ধনে পাতা, তিল, মটর, কালোজিরে, কলাই, মুসূরের চাষ হচ্ছিল। গ্রাম্যপথে যেতে যেতে অনেক অজানাই জানা হয়ে যাচ্ছিল। শিক্ষক মহাশয় বলেছিলেন পরিবেশ পর্যবেক্ষণের জন্য পালন করতে হবে কতগুলি বিষয়-

(i) See the Nature (ii) Know the Natue (iii) Serve the Nature (iv) Love the Nature.

এই পর্যবেক্ষণ শিবিরে কিছু বিদ্যালয় অংশগ্রহণ করেছিল। তাদের সাথে দলবদ্ধভাবে এযাত্রায় আমি অপার আনন্দ লাভ করেছি। মন মাতানো প্রাণ জুড়োনো প্রকৃতি থেকে বিদায় নেওয়ার সময় তাই মন মাঠে ফুটে থাকা ঘাসফুলটির কানে কানে বলেছিলাম-

"আবার আসিব ফিরে"

হাতে কলমে শেখা ও প্রকৃতির বুকে স্বচ্ছন্দ বিচরণের যে অকল্পনীয় অনুভূতি তা আমাকে ভবিষ্যতে আরো ভালো কিছু করতে অনুপ্রাণিত করবে বলে আশা রাখছি। ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড় এই অকৃত্রিম জগৎ থেকে শহরের কোলাহলে ফিরে আসার সময় মনে মনে ভেবেছিলাম-

" এই ডাঙা ছেয়ে হায় রূপকে খুঁজিতে যায় পৃথিবীর পথে "

যে সকল শিক্ষক শিক্ষিকার সহৃদয় প্রচেষ্টায় আমি ওই প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ শিবিরে অংশগ্রহণ করতে পেরেছিলাম তাঁদের জানাই অকৃত্রিম শ্রদ্ধা।

-সুপ্তি লোধ

প্রথম বর্ষ

ভ্রমন কাহিনী

সুন্দরী হিমাচল প্রদেশ

দিনটা ১৭ই এপ্রিল, ২০০৭ রবিবার, কৃষ্ণনগর স্টেশন থেকে দুপুর ২টা ৩০ মিনিটে ট্রেন ধরে সোজা শিয়ালদা তারপর হাওড়া। সন্ধ্যা ৭টা ৪০ এ কালকা মেল ধরে রওনা। কোথায়? সুন্দরী হিমালয়। পশ্চিমবঙ্গ এর সীমানা অতিক্রম করে বিহার, উত্তরপ্রদেশ, দিল্লী পার হয়ে প্রায় তিন দিন পর পৌঁছালাম কালকা। সেখানে ট্রয় ট্রেন ধরে সিমলার দিকে যাত্রা।

ট্রেনটার নাম শিবালিক পথে পড়ল পাইনের বন। ছোট্ট দু-একটা হিল স্টেশন। কখনও বা পেরতে হচ্ছে ব্রিজ কিংবা ট্যানেল। কখন বা ট্রেন পাহাড়ি খাতের পাশ দিয়ে যাচ্ছে যার মধ্যে খরস্রোতা নদী বইছে। কখনওবা ট্যানেল পেড়িয়ে চোখে পড়ছে বরফে আবৃত শ্বেতশুভ্র গিরিশৃঙ্গ। যা এক নিমেষে লংজার্নির ক্লান্তি ভুলিয়ে দেয়।

দেখতে দেখতে ট্রেন থামল। সিমলা এসে পড়েছি। এটা হিমাচল প্রদেশের রাজধানী। পাহাড়ের ঢালে ছোট একটা হিল স্টেশন। হোটেল গুলি সবই সবই আরেকটু ওপরে যেতে হবে। তাই টাটা সুমো করে সবাই মিলে গেলাম হোটেলে। হোটেলের নাম গুলমার। পথের ধারে রডেরেনড্রন কখন বা পাইন কখন বা নাম না জানা পাহাড়ি ফুল। গাছ থেকে ছুটে আসা পাখির ডাক। হোটেল এসে গেল।

সকালবেলা কালকা থেকে বেড়িয়ে সিমলা আসতে দুপুর হয়ে গেছিল তাই একটু বিশ্রামের প্রয়োজন ছিল। সন্ধ্যা ৭টা ৩০ নাগাদ প্রথমে গেলাম সিমলা ম্যালে। ম্যালে গিয়ে এক অসাধারণ দৃশ্য ! রাত মানেই তো আলো, কিন্তু আলোর রোশনায় একটা শহর কতটা ঝলমল করছে তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায়না। শীতের মধ্যে জমজমাট ম্যাল দুরে পাহাড়ের কোলে বাড়ীগুলিতে আলো জ্বলছে, অন্ধকার মুছতেই সবাই আলো জ্বেলেছে তাদের প্রয়োজনে। আর তার ছোঁয়ায় সারা পাহাড়টা অন্ধকার আকাশের নক্ষত্রমণ্ডলীর মত দেখতে লাগছে। যা দেখতে দেখতে প্রায় রাত হয়ে গেল। নৈশ ভোজের সময় হয়ে গেছে। গেলাম সিমলা কালিবাড়ি, কালিবাড়ি গিয়ে সামনের খোলা প্রাঙ্গণটায় ম্যালের সেই দৃশ্য আবার দেখা গেল মানে পাহাড়ের ঢালে সেই আলোর মালা। সামনের এই দৃশ্য পুরহিতের মুখে শক্তির মন্ত্র উচ্চারণ সব মিলিয়ে এক মনে হচ্ছিল এ যেন অন্য জগতে চলে আসা। পরদিন সকালে রওনা দিলাম কুলুর দিকে। রাস্তার একধারে পাহাড় অন্য খাড়া খাদ দুটোই রডেরেনড্রন, পাইন, ফার এইসব সরল বর্গীয় বৃক্ষের ঘন অরণ্যে ঢাকা। আবার খাদ, খাদের মধ্যে দিয়ে বইছে স্রোতস্বিনী রিয়াস। রিয়াস হল সিন্ধুর উপনদী। দেখতে দেখতে কুলু এসে গেলাম, সেখানে দুটি মন্দির আছে। সন্তোষী মার মন্দির ও হনুমান মন্দির। মন্দির দেখে রিয়াসের ধারে গিয়ে একটু বসলাম। জলের সে কি স্রোত। প্রবল জলধারা সমস্ত কিছু পিছনে ফেলে ছুটে চলেছে। তারই মধ্যে তৈরি করছে নদী ক্ষয় কারী ভূমিরূপ। 'V' আকৃতির নদীখাদ বা শৈলশিরা অভিক্ষেত কত কিছু। গাড়িতে উঠলাম, এবার রওনা মনিকরনের পথে। রিয়াস ছুটেছে দক্ষিন থেকে পুর্বে, আমরা যাচ্ছি তারই বিপরীতে। পথের ধারে সেই পাইন, ফার অর্কিটেক্ট এর অসাধারণ কৃতিত্ব। হঠাৎ সম্মুখে এসে গেল গগন চুম্বী শ্বেত শুভ্র বরফাবৃত গিরিশ্রেণী। যার দুপাশে খাদ আর পাইন এর পাহাড়। পাহাড়ী রাস্তা পাহাড়ের ঢাল বেয়ে উঠে চলা অভিকর্ষের বিপরীতে। এযেন উচুতে ওঠার এক যাত্রা। দেখতে দেখতে সকাল গড়িয়ে দুপুর হল। সকালের খাবার হজম হয়ে পাকস্থলী থেকে ক্ষুদ্রান্তে চলে গেছে তাই খাওয়াটা খুবই জরুরি। পথিমধ্যে এক হোটেলে দুপুরের খাওয়া সেরে আবার রওনা হলাম। গাড়ীর মধ্যে সবার চোখে দুপুরের ঘুম ঢুলু ঢুলু। কেউবা ঘুমিয়ে আছে। গাড়ীর সামনের সিটে ড্রাইভার ও আমি ব্যস্ত, সে ব্যস্ত পাহাড়ি পথে বিপদ এড়িয়ে তার যাত্রীকে গন্তব্যে পৌছাতে। আর আমি প্রকৃতির অপরূপ কৃতীকে মনের ক্যামেরায় ভিভিও করতে, যা চোখ বন্ধ করলে সারা জীবন ফ্ল্যাশব্যাক হবে। দেখতে দেখতে মনিকরন এসে গেলাম। গাড়ি থেকে নেমে ব্রীজ পেরলাম। আর দেখতে পেলাম রিয়াসের সে কি ভয়ঙ্কর অথচ ক্ষরস্রতা রূপ। এখানে শিক ধর্মশালা আছে। যেখানে আমাদের থাকতে হবে। ঠান্ডা হিমের পরশ গায়ে মেখে এতক্ষন আসার ফলে একটু গরম পোশাকে প্রয়োজন হল। তাই শোয়েটার আর টুপি এসব পরে একছুটে চলে গেলাম সামনের মুক্ত প্রাঙ্গনে। জ্যাঠিমা ক্যামরা হাতে রেডি আমাদের ছবি তুলবে বলে। তবে আমরাতো নিমিত্ত মাত্র আসলে লেন্স বন্দী হল গোলাপ ওপাহাড়ী নাম না জানা ফুল আর সামনে পাইনের অরণ্যে ঢাকা পাহাড় ও

দুরে বরফ ঢাকা পর্বত। সূর্যাস্ত গেল আকাশটা লাল, নীচে বইছে স্রোতস্বিনী রিয়াস। এককথায় অসাধারন সন্ধ্যা হল।

এরপর রওনা হলাম মানালির পথে। মানালির পথে যেতে যেতে আর একটা জিনিস যোগ হল সেটা হল আপেলের বাগান। পাইন, ফার এর অরণ্য , পাহাড় খাদ বরফাবৃত পর্বতশ্রেণীর হাতছানির সাথে আপেলের বাগান পথে যাত্রার ক্লান্তিকে দুরে ফেলে দেয়। দেখতে দেখতে মানালী চলে এলাম। গাড়ি থেকে যখন নামলাম তখন সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়েছে। হোটেলের নাম শৃগাল। লাগেজ নিয়ে ঘরে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে এককাপ গরম পানীয় সাথে ব্যালক নিতে দাড়িয়ে বামপাশে শ্বেতশুভ্র পর্বতরাশি ডানদিকের পাহাড় পাইন বনে ঢাকা, সামনে পার্বত্য উপত্যকায় গড়ে উঠেছে জনবসতি। মানালি একটি পর্যটন শহর। পর্যটন কেন্দ্র করে এখানে জনবসতি গড়ে উঠেছে। এর আগে গ্যংটকের ছাংগুতে বরফ দেখেছিলাম। বরফ রাজ্যের সাথে সেই আমার প্রথম পরিচয়, ১১৯০০ফুট উচুতে। কাল যাব আর এক জায়গাযর, ভাবতে ভাবতে দুচোখে ঘুম চলে এলো। চোখ খুলতেই সকালে উঠে দেখি সবাই তৈরি। তাড়াতাড়ি করে স্নান সেরে কোর্ট, টুপি, মোজা, জিন্স, সু পরে রেডি হয়ে ব্রেকফাস্ট করতে এলাম। ব্রেকফাস্ট এ কলফ্লেক্স আর কপি খেয়ে আয়নার সামনে গিয়ে ত্বককে ঠান্ডার হাত থেকে বাঁচাতে ক্রিম লাগালাম। যাইহোক ত্বকের কথাও তো ভাবতে হয় শুধু দেখলেই হলনা। গাড়িতে উঠলাম যাত্রা শুরু, যাত্রার পথে পাইন,ফার এর অরণ্য পেড়িয়ে চলে এলাম। ক্ষণস্থায়ী তুষার ফলক গাছে পাতার উপর পড়ে কোথাও বা পথের দুধারে। দেখতে দেখতে বৃক্ষরাজি সংখ্যা হ্রাস পেতে লাগল। এখানেই মানে এই পথেই 'বর্ডার' সিনেমার সুটিং হয়েছে। ক্ষনস্থায়ী বরফ পেড়িয়ে চলে এলাম বরফের রাজ্যে। পাইনএর জঙ্গল ও বিদায় জানাল। চোখের সামনে গিরিরাজের তুষার মহলের প্রবেশ দ্বার। সেখানে বনস্পতির প্রবেশ নিষেধ। ধমকে দাঁড়িয়ে থাকা গাছ গুলি যেন বলছে ''এখানে থেমে গেলাম' তুষার মহল থেকে ঘুরে এস আবার দেখা হবে। ঐ দেখ প্রস্তর ফলকে যদিও আছে বনস্পতির প্রবেশমানা" সত্যি গাছগুলি মিথ্যা বলেনি। ভৌগোলিক নিয়মানুসারে বৃক্ষশেষে এখানে শুরু হয়েছে লতা গুল্ম অনেকদিন যাতে কেউ যত্ন করেনি। পৃথিবীর বুকে তার জীর্নদেহটিকে নিয়ে দাড়িয়ে আছে আর তা গা বেয়ে জন্ম নিয়েছে নবজাতকেরা। দেখতে দেখতে তারাও বিদায় নিল। সামনে দাড়িয়ে আকাশচুম্বী পর্বত যেন দুহাত বাড়িয়ে ডাকছে এস। আর সেই শৃঙ্গের সূর্যালোক পড়ে চকমক করছে। হঠাৎ গাড়ি থামল। ড্রাইভার বলল এখান থেকে হেটে যেতে হবে। একধারে উচু বরফের দেওয়াল অন্যদিকে পর্বতের খাত আর মাঝখানে সংকীর্ণ রাস্তা। হিমাঙ্কের নীচে থাকা বাতাস গায়ে লাগিয়ে চাউমিন খাওয়া উপভোগ করলাম। পথে আসতে একদোকানে নিজেদের জুতোগুলো খুলে স্নোবুট পড়া হয়েছিল তিতলি আর ডুডুর সেই জুতোই বরফ ঢুকে গেল। আর তারা সে জুতোজোড়া ফেলেই দিচ্ছিল পরে তা থেকে বরফ বার করে আবার পড়ানো হল, এই দেখে আমাদের ড্রাইভারের সে কি হাসি! যাইহোক স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য ক্যামেরা আনা হয়েছিল। এবার শুরু হল বরফ ছোড়াছুড়ি খেলা। তারপর আমরা তুষার মহলকে বিদায় জানিয়ে গাড়ীতে গিয়ে উঠলাম। তবে রোটানের সেই বরফ মনের মণিকোঠায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা রইল। যাত্রাপথে একটা জায়গা পরল তার নাম সোলাতভ্যালি। দুপাশে পাহাড় আর মাঝে উপত্যকা আকাশে দু-একটা প্যারাসুট দেখা গেল। চারিপাশে রাশিকৃত বরফ, কোথাও বা পাইন গাছের সারি। এবার মানালি হোটেলে ফিরে এলাম। রাতে খাওয়া দাওয়ার জন্য বেরোলাম। পরদিন মানালিতে কেনাকাটা করলাম। শপিংমল, মার্কেট, ম্যাল মার্কেট দেখে মানালি পার্কে গেলাম। রিয়াসের ঘন জলের ছল ছল শব্দে মনে হচ্ছিল যেন কালো বনদেবী চোখের অলক্ষ্যে জলতরঙ্গ বাজাচ্ছে যা পাইন বন পেড়িয়ে কানে আসছিল। পরে নদীর ধারে একটা পাথড়ে বসে রিয়াসের জলে পা নাচাতে নাচাতে ভাবছিলাম আর দেখছিলাম স্রোতস্বিনী রিয়াসের কি সুন্দর ই না রূপ। মানালী থেকে সারহাস যেতে পথে পরে জালরিপাস। সেখানে কিছুক্ষণ রেস নিয়ে সাড়ে পাঁচটা নাগাদ সারহান পৌছালাম। পরের দিন স্নান সেরেএকটা মন্দির আছে সেখানে পূজো দিলাম। এরপর ব্রেকফাস্ট সেরে বিখ্যাত নালটি স্টেডিয়ামে গেলাম। গ্যালারীর পিছনে পাহাড়ে শ্বেতশুভ্র পর্বতরাশি এককথায় অদ্বিতীয়া সুন্দরী। এই হিমাচল এখানে তার সৌন্দর্যের ডালি খুলে উজার করেছে তার রূপ, আমরা তা দুচোখ ভরে উপভোগ করলাম। এরপর আমরা সাংলায় এসে পৌছালাম। গাড়ি থেকে নেমে সেকি ঠাণ্ডা। উত্তাল হিমজরানো বাতাস বইছে, যার পরশ গায়ে মেখে বেশীক্ষন বাইরে থাকা গেলনা। তারাতারি ঘরে ঢুকে পরলাম। সারারাত চলল সেই শৈত প্রবাহ। পরদিন সকালে গেলাম চিটফুল। হোটেল থেকে বেড়িয়ে ক্ষরস্রোতা বিধ্বংসী রিয়াসের পাশ দিয়ে যেতে যেতে বরফাবৃত শ্বেত শুভ্র পর্বত দেখতে পেলাম। যার ওপারে পাইন এর বন আর মাঝে মাঝে বরফ। আর নদী দিয়ে বয়ে যাচ্ছে তীব্র স্রোতের জল যাতে ছোট ছোট নুড়ি পরে আছে। নদীর জল পাথড়ে ধাক্কা খেয়ে ঘূর্ণাবর্ত সৃষ্টি করছে।

হিমাবাহ থেকে উৎপন্ন সদ্যযাত রিয়াসের জলধারা একটি বড় পাথড়ের উপর বসে দেখতে দেখতেমনে হচ্ছিল জলদেবী যেন ছন্দে ছন্দে জলতরঙ্গ বাজাচ্ছে। আর গাছপালা ও প্রকৃতি স্তম্ভিত হয়ে তা শ্রবণ করছে। দুরে একটা স্কুল দেখা গেল। হোটেলে ফিরে আসার পথের দুদিকে অনেকগুলো আপেল বাগান পেলাম তার একটাতে ঢুকে পড়লাম। সারি সারি আপেল গাছ আর তাতে ধরে আছে আপেলের ফুল। কিঅপরূপ দৃশ্য! যা দেখে জীবন স্বার্থক হয়। রাতে হোটেল থেকেই পাহাড়ের বুকে চাঁদের রোশনায় দেখলাম। পরদিন আমরা গেলাম কলপার। সেটি একটি খারা খাত খাদে যা উপর থেকে নীচ দেখা যায় না। এটি দেখতে গিয়ে নাকি অনেকেই মারা গেছেন। তাই এটির নাম সুইসাইড স্পট। আমি ভীষন ভীতু তাই সুন্দর এই পৃথিবীকে ছেড়ে এত সৌন্দর্যের মধ্যে থেকে অন্য কোথাও যেতে চাইনা বলে সোজা গাড়িতে গিয়ে উঠলাম।

পরদিন সিমলা থেকে বাড়ির দিকে রওনা দিলাম কালকা এক্সপ্রেসে চড়ে সোজা হাওড়ায়। সেখানথেকে অবশেষে নিজের মাতৃভূমি কৃষ্ণনগরে ফিরে এলাম অনেক আনন্দ ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে।

- পল্লবী হালদার
প্রথম বর্ষ

প্রকৃতি প্রেমী রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ রোমান্টিক কবি ছিলেন। প্রকৃতিকে রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখলে ব্যক্তি ও প্রকৃতি প্রেম সহানুভূতির শিকলে বাঁধা পড়ে। এ কেবল প্রকৃতির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হওয়ার নয়, এযেন ধর্মবোধ। রোমান্টিকদের প্রকৃতি ও বৈজ্ঞানিকদের প্রকৃতি এক নয়। কল্পনার সাহায্যে প্রকৃতিকে যেভাবে দেখা সম্ভব তা মুক্তিতে কখনও ধরা পরেনা। আকাশে তারার বিরাট আকৃতি, উষ্ণতা, তীব্র গতি যেমন সত্য, তারার স্নিগ্ধতা তার চেয়ে কম নয়।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে উপনিষদের সম্পর্ক নিয়ে সর্বদা জেনে এসেছি। তাঁর উপর উপনিষদের প্রভার অনস্বীকার্য। তবে উপনিষদের পরিচয়ের আগে থেকেই তিনি পুরোদস্তুর রোমান্টিক। সেই কারনে উপনিষদ তাঁকে বিশেষ সময় বিশেষভাবে প্রভাবিত করে এসেছে।

গীতাঞ্জলির অধ্যায়ে উপনিষদকে তিনি প্রকৃতির কাব্য বলে ব্যক্ত করেছেন। উপনিষদের যে ঐক্যবোধ ছিল তা, রবীন্দ্রনাথের ঐক্যবোধের সঙ্গে অনেকটায় সাদৃশ্যতা পেয়েছিল। সবকিছু আনন্দ থেকে উৎপত্তি, আনন্দের মধ্যে অবস্থান ও শেষে আনন্দের মধ্যে গমন- এই উপনিষদের ভাব তার ধারনার সঙ্গে মিলেছিল। উপনিষদের 'আনন্দ' রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে 'উদ্বৃত্তের' (Surplus) ধারনার সঙ্গে মেলে।

মানুষের প্রয়োজন পেড়িয়ে যে সত্তা যার উপরে মানুষের সৃজনশীলতা, বিজ্ঞানসাহিত্য, সব নির্ভর করে আছে- সেখানেই তার মনুষ্যত্ব, সেখানেই তার আনন্দ।

রবীন্দ্রনাথ ইন্দ্রিয়বোধের বাইরে অদ্বিতীয়কে খুঁজতে চাননি। ইন্দ্রিয়ই হল জ্ঞানের পথ। বয়সকালে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের শক্তি রূপকে একটা গতির মধ্যে রেখেছেন যা পূর্ণতার দিকে সতত চলমান।

মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্কের মধ্যে অসীমের প্রকাশ মানুষের সৃজনশীলতার মধ্যেইপ্রকাশিত। প্রেম, সহানুভূতিতে কল্পনায় প্রকৃতির মধ্যে অসীমকে পাওয়া যায়। মানুষের অন্তরে যার সন্ধান মেলে প্রকৃতির মধ্যে তারই সন্ধান পাওয়া যায়। মানুষ সভ্যতা ও প্রকৃতি উভয়েরই সন্তান। সৃজনশীল কল্পনায় এই দুই জগতের বাঁধ বাঁধতে হবে।

- পিয়ালী ঘোষ
(সংস্কৃত বিভাগ)

হিমাবাহ থেকে উৎপন্ন সদ্যযাত রিয়াসের জলধারা একটি বড় পাথড়ের উপর বসে দেখতে দেখতেমনে হচ্ছিল জলদেবী যেন ছন্দে ছন্দে জলতরঙ্গ বাজাচ্ছে। আর গাছপালা ও প্রকৃতি স্তম্ভিত হয়ে তা শ্রবণ করছে। দুরে একটা স্কুল দেখা গেল। হোটেলে ফিরে আসার পথের দুদিকে অনেকগুলো আপেল বাগান পেলাম তার একটাতে ঢুকে পড়লাম। সারি সারি আপেল গাছ আর তাতে ধরে আছে আপেলের ফুল। কিঅপরূপ দৃশ্য! যা দেখে জীবন স্বার্থক হয়। রাতে হোটেল থেকেই পাহাড়ের বুকে চাঁদের রোশনায় দেখলাম। পরদিন আমরা গেলাম কলপার। সেটি একটি খারা খাত খাদে যা উপর থেকে নীচ দেখা যায় না। এটি দেখতে গিয়ে নাকি অনেকেই মারা গেছেন। তাই এটির নাম সুইসাইড স্পট। আমি ভীষন ভীতু তাই সুন্দর এই পৃথিবীকে ছেড়ে এত সৌন্দর্যের মধ্যে থেকে অন্য কোথাও যেতে চাইনা বলে সোজা গাড়িতে গিয়ে উঠলাম।

পরদিন সিমলা থেকে বাড়ির দিকে রওনা দিলাম কালকা এক্সপ্রেসে চড়ে সোজা হাওড়ায়। সেখানথেকে অবশেষে নিজের মাতৃভূমি কৃষ্ণনগরে ফিরে এলাম অনেক আনন্দ ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে।

- পল্লবী হালদার
প্রথম বর্ষ

প্রকৃতি প্রেমী রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ রোমান্টিক কবি ছিলেন। প্রকৃতিকে রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখলে ব্যক্তি ও প্রকৃতি প্রেম সহানুভূতির শিকলে বাঁধা পড়ে। এ কেবল প্রকৃতির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হওয়ার নয়, এযেন ধর্মবোধ। রোমান্টিকদের প্রকৃতি ও বৈজ্ঞানিকদের প্রকৃতি এক নয়। কল্পনার সাহায্যে প্রকৃতিকে যেভাবে দেখা সম্ভব তা মুক্তিতে কখনও ধরা পরেনা। আকাশে তারার বিরাট আকৃতি, উষ্ণতা, তীব্র গতি যেমন সত্য, তারার স্নিগ্ধতা তার চেয়ে কম নয়।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে উপনিষদের সম্পর্ক নিয়ে সর্বদা জেনে এসেছি। তাঁর উপর উপনিষদের প্রভার অনস্বীকার্য। তবে উপনিষদের পরিচয়ের আগে থেকেই তিনি পুরোদস্তর রোমান্টিক। সেই কারনে উপনিষদ তাঁকে বিশেষ সময় বিশেষভাবে প্রভাবিত করে এসেছে।

গীতাঞ্জলির অধ্যায়ে উপনিষদকে তিনি প্রকৃতির কাব্য বলে ব্যক্ত করেছেন। উপনিষদের যে ঐক্যবোধ ছিল তা, রবীন্দ্রনাথের ঐক্যবোধের সঙ্গে অনেকটায় সাদৃশ্যতা পেয়েছিল। সবকিছু আনন্দ থেকে উৎপত্তি, আনন্দের মধ্যে অবস্থান ও শেষে আনন্দের মধ্যে গমন- এই উপনিষদের ভাব তার ধারনার সঙ্গে মিলেছিল। উপনিষদের 'আনন্দ' রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে 'উদ্বৃত্তের' (Surplus) ধারনার সঙ্গে মেলে।

মানুষের প্রয়োজন পেড়িয়ে যে সত্তা যার উপরে মানুষের সৃজনশীলতা, বিজ্ঞানসাহিত্য, সব নির্ভর করে আছে- সেখানেই তার মনুষ্যত্ব, সেখানেই তার আনন্দ।

রবীন্দ্রনাথ ইন্দ্রিয়বোধের বাইরে অদ্বিতীয়কে খুঁজতে চাননি। ইন্দ্রিয়ই হল জ্ঞানের পথ। বয়সকালে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের শক্তি রূপকে একটা গতির মধ্যে রেখেছেন যা পূর্ণতার দিকে সতত চলমান।

মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্কের মধ্যে অসীমের প্রকাশ মানুষের সৃজনশীলতার মধ্যেই প্রকাশিত। প্রেম, সহানুভূতিতে কল্পনায় প্রকৃতির মধ্যে অসীমকে পাওয়া যায়। মানুষের অন্তরে যার সন্ধান মেলে প্রকৃতির মধ্যে তারই সন্ধান পাওয়া যায়। মানুষ সভ্যতা ও প্রকৃতি উভয়েরই সন্তান। সৃজনশীল কল্পনায় এই দুই জগতের বাঁধ বাঁধতে হবে।

- পিয়ালী ঘোষ
(সংস্কৃত বিভাগ)

কৃষ্ণনগর উইমেন্স কলেজ ছাত্রী সংসদ - ২০১২- ১৩

G.S.	.....	দূর্বা মন্ডল
A.G.S.	.....	অনিন্দিতা পাল
V.P.	.....	জয়তী মজুমদার
Treasure	.....	পিয়ালী বিশ্বাস
Cultural Secretary	.....	রিয়া চন্দ্র
Games & Sports	.....	সমর্পিতা পাল
Magazine & Library	.....	ঋতুপর্ণা পাল
Bijnan Parisad	.....	দিপিকা হালদার
Student Welfare & Social Service	.....	সাধনা মন্ডল
Common Room	.....	পারমিতা সাধুখাঁ

সাধারন সম্পাদিকাদের তালিকা

১৯৫৮-৫৯ - শিপ্রা রায়
১৯৫৯-৬০ - সুলেখা ভট্টাচার্য্য
১৯৬০-৬১ - দীপান্বিতা বসু
১৯৬১-৬২ - ঝর্ণা চট্টোপাধ্যায়
১৯৬২-৬৩ - কল্পনা বিশ্বাস
১৯৬৩-৬৪ - সুনীতা পোদ্দার
১৯৬৪-৬৫ - গীতা পালচৌধরী
১৯৬৫-৬৬ - স্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায়
১৯৬৬-৬৭ - গীতা পালচৌধরী
১৯৬৭-৬৮ -লীলা মজুমদার
১৯৬৮-৬৯ - মালবিকা দত্ত
১৯৬৯-৭০ - অপর্ণা সরকার
১৯৭০-৭১ - করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়
১৯৭১-৭২ - নন্দিতা চক্রবর্তী
১৯৭২-৭৩ - জয়ন্তী মালাকার
১৯৭৩-৭৪ - শিখা চক্রবর্তী
১৯৭৪-৭৫ - সন্ধ্যা হাজরা
১৯৭৫-৭৬- সংঘমিত্রা ঘোষ
১৯৭৬-৭৭ - পঞ্চশীলা মজুমদার
১৯৭৭-৭৮- সুজাতা গঙ্গোপাধ্যায়
১৯৭৮-৭৯- কোন ছাত্রী সংসদ ছিল না
১৯৭৯-৮০- কোন ছাত্রী সংসদ ছিল না
১৯৮০-৮১- রীতা দে
১৯৮১-৮২- চৈতালী বন্দ্যোপাধ্যায়
১৯৮২-৮৩ - মীরা ধর
১৯৮৩-৮৪- তাপসী জোয়ার্দার
১৯৮৪-৮৫ - কোন ছাত্রী সংসদ ছিল না
১৯৮৫-৮৬- কোন ছাত্রী সংসদ ছিল না
১৯৮৬-৮৭- আত্রেয়ী মুখোপাধ্যায়
১৯৮৭-৮৮- আত্রেয়ী মুখোপাধ্যায়
১৯৮৮-৮৯- প্রীতিকণা নাথ
১৯৯০-৯১ - সাথী সাহা
১৯৯১-৯২ - ইন্দ্রাণী রায়
১৯৯২-৯৩ - মিঠু ভাদুড়ী
১৯৯৩-৯৪ - শাশ্বতী বিশ্বাস
১৯৯৪-৯৫ - দীপা ঘোষ
১৯৯৫-৯৬ - শিবানী নন্দী
১৯৯৬-৯৭ - গোপা তরফদার
১৯৯৭-৯৮ - পারমিতা মন্ডল
১৯৯৮-৯৯ - বাসন্তী হালদার
১৯৯৯-২০০০ - রূপা নন্দী
২০০০-২০০১ - রূপা নন্দী
২০০১-২০০২ - রূপা নন্দী
২০০২-২০০৩ - শিপ্রা দেবনাথ
২০০৩-২০০৪ - অনুরাধা দে
২০০৪-২০০৫ - দেবযানী মন্ডল
২০০৭-২০০৮ - প্রিয়াঙ্কা সরকার
২০০৮-২০০৯ - হীরা খাতুন
২০০৯-২০১০ -কুহেলী বিশ্বাস
২০১০-২০১১ - প্রিয়াঙ্কা বিশ্বাস
২০১১-২০১২ - প্রিয়া দত্ত
২০১২-২০১৩ - দূর্বা মন্ডল